‘জেলখানা’ বানানোর উদ্দেশ্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নেই

উত্তর সম্পাদকীয়

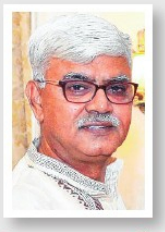

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

মেলার মাঠে প্রাচীর তোলা যদি ‘রবীন্দ্র-আদর্শ বিরোধী’ হয়, তাহলে দুবরাজপুর থেকে লোকভাড়া করে নম্বর-ঢাকা পে-লোডার দিয়ে বিশ্বভারতী-র দুটো গেট পেশির জোরে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া কোন যুক্তিতে ‘রবীন্দ্র-আদর্শ’ অনুসারী কাজ তার ব্যাখ্যা আশ্রমের রাবীন্দ্রিকরাই দিতে পারবেন হয়তো! সেদিন শুধু বিশ্বভারতীর দুটো গেট ভূমিসাৎ হয়নি, সেইসঙ্গে ধুলোয় মিশেছে বিশ্বভারতীর আত্মমর্যাদা।

১৭ আগস্ট শান্তিনিকেতনের মেলার মাঠের সীমানা-চৌহদ্দি নির্মাণ নিয়ে যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটল তাতে দিনটিকে বাংলার সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষ ‘কালো দিন’ হিসাবেই সম্ভবত চিহ্নিত করবেন। মেলার মাঠে প্রাচীর তোলা যদি ‘রবীন্দ্র-আদর্শ বিরোধী’ হয়, তাহলে দুবরাজপুর থেকে লোকভাড়া করে নম্বর-ঢাকা পে-লোডার দিয়ে বিশ্বভারতী-র দুটো গেট পেশির জোরে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া কোন যুক্তিতে ‘রবীন্দ্র-আদর্শ’ অনুসারী কাজ তার ব্যাখ্যা আশ্রমের রাবীন্দ্রিকরাই দিতে পারবেন হয়তো! সেদিন শুধু বিশ্বভারতীর দুটো গেট ভূমিসাৎ হয়নি, সেইসঙ্গে ধুলোয় মিশেছে বিশ্বভারতীর আত্মমর্যাদা। তবু প্রবল রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে মুখ খোলার ‘বোকামি’ নিশ্চয় রাবীন্দ্রিক আশ্রমিকরা করতে যাবেন না! কে বা কারা মেলার মাঠে ‘জেলখানা’ হচ্ছে বলে রটিয়ে দিলেন, অমনি তাঁরাও জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলেন! কেন এই উদ্দেশ্যমূলক রটনা, কোন অভিসন্ধি নিয়ে অতিমারীর সময় থানার নাকের ডগায় ট্র্যাক্টর-ভর্তি হাজার-হাজার ভাড়াটে লোক জোগাড় করা হল, নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই তা জানা যাবে।

ছোটবেলা থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতনের খোলামেলা পরিবেশে বড় হয়ে আজ বয়স্ক হয়েছেন, ধরে নিচ্ছি, তাঁদের একটা বিশেষ ধরনের শান্তিনিকেতন-আবেগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রয়োজন হল, আবেগের সঙ্গে একটু যুক্তিবোধ। গত ৬০-৭০ বছরে তাঁদের বয়স যেমন বেড়েছে, তেমনই কালের দাবিতে একটু একটু করে শান্তিনিকেতনও বদলেছে। খোলামেলা শান্তিনিকেতনে প্রয়োজনমতো সীমানা-ঘেরার কাজ তো শুরু হয়েছিল তাঁদের অনেকের জন্মেরও আগে থেকে। ‘শিল্পাচার্য’ নন্দলাল বসুর পাঁচিল-ঘেরা শান্তিনিকেতন ভাল লাগেনি। তাঁর মতো মানুষের হয়তো ভাল লাগার কথাও নয়। কিন্তু তাঁরই লেখা ১৯৪২ সালের একটা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, পাঁচিল তোলার কাজ সেই সময়েও ঘটেছে আশ্রমে। আমাদের এস্টেট বিভাগের নথি থেকে জানা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, আশ্রম মাঠে ‘ল্যান্ডিং ম্যাট’ দিয়ে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়। গুরুদেবের সদ্যপ্রয়াণের পর, সেসময় নন্দলাল বসুর শিক্ষক ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর আচার্য পদে আসীন ছিলেন। আর বিশ্বভারতী চালাচ্ছেন তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার মানে রবীন্দ্রনাথের একান্ত আপন দু’জন যখন বিশ্বভারতীর কর্ণধার, সেই সময়েই শান্তিনিকেতনে পাঁচিল তোলার মতো ‘অতি অরাবীন্দ্রিক’ কাজটির সূচনা হয়! রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উত্তরায়ণের চারপাশে তারের বেড়া দিয়ে দেন প্রাথমিকভাবে। এরপর সাতের দশকে অতিবাম বিপ্লবীরা যখন বাংলার সব ঐতিহ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তখন উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে মূল আশ্রম-চত্বরে শক্তপোক্ত করে বেড়া দিতে হয়। সেইটুকু আড়াল যে প্রয়োজনীয় ছিল, তা আজ হয়তো কেউ আর অস্বীকার করবেন না। উপাচার্য সুজিতকুমার বসুর সময় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের চারপাশে পাঁচিল দিতে হয়। সেসময় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটা হামলার ঘটনার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সময়ও পাঁচিল নিয়ে আপত্তি উঠেছিল আশ্রমে। তবে আজ অনেকেই স্বীকার করেন, ওইটুকু ঘেরাটোপ আর সামনের লনের ফুলের বাগান কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মহিমা কোথাও একটুও ক্ষুণ্ণ করেনি। মনে রাখতে হবে, ২০০৪ সালের নোবেল চুরির মতো কলঙ্ক-লাঞ্ছিত দিন শান্তিনিকেতনে আর আসেনি। বিশ্বভারতীর ঢিলেঢালা নিরাপত্তা-ব্যবস্থা দিয়ে যে আর চলবে না, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল সেদিনই। এরপর উপাচার্য রজতকান্ত রায় ২০০৮ সালে বিশ্বভারতীর সীমানা-চিহ্ন নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হন। তার ফলে শান্তিনিকেতনের অনেক পুরনো আশ্রমিকের বাড়ি আড়ালে চলে যায়। কিন্তু তার কারণ হল, বিশ্বভারতীর জটিল ভূগোল। মহর্ষির কুড়ি বিঘের আশ্রম একটু একটু করে বেড়ে প্রায় তিন হাজার ছশো বিঘের আজকের বিশ্বভারতী হয়েছে। ফলে, অনেক জায়গাতেই বিশ্বভারতীর জায়গার মধ্যে ছিটমহলের মতো ঢুকে গিয়েছে ব্যক্তিগত জমি। অনেকে বিশ্বভারতীর জায়গা দখল করে দিব্যি অস্থায়ী বা স্থায়ী কাঠামো বানিয়েছেন। গত ২৫ জুলাই বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে সেসব ‘জমিহাঙর’দের নিয়ে একটি বার্তালাপে আমি তা বিস্তারিত লিখেছি। দুঃখের কথা, আশ্রমিক বা বিশ্বভারতীর কর্মী-অধ্যাপকদেরও কেউ কেউ সেই দখলদারদের মধ্যে রয়েছেন। বিশ্বভারতী যখনই সেসব উদ্ধার করতে গিয়েছে, তখনই স্থানীয় রাজনীতির ‘বড়দাদা’-রা অথবা ‘শান্তিনিকেতন আবেগ’-কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে তাঁরা পার পেতে চেয়েছেন।

> ‘শিল্পাচার্য’ নন্দলাল বসুর পাঁচিল-ঘেরা শান্তিনিকেতন ভাল লাগেনি। কিন্তু তাঁরই লেখা ১৯৪২ সালের একটা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, পাঁচিল তোলার কাজ সেই সময়েও ঘটেছে আশ্রমে। আমাদের এস্টেট বিভাগের নথি থেকে জানা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, আশ্রম মাঠে ‘ল্যান্ডিং ম্যাট’ দিয়ে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়।

২০০৬ সালে প্রকাশিত রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত হাই লেভেল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করেন উপাচার্য রজতকান্ত রায়। সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন আরেক প্রাক্তন উপাচার্য অম্লান দত্ত। আসলে বিশ্বভারতীর সীমানা ও সুরক্ষা নিয়ে একের পর এক নির্দেশ আসতে থাকে ২০০৪ সালে নোবেল চুরির পর থেকেই। গোপালকৃষ্ণ গান্ধী কমিটি ছাড়াও ইউজিসি কমিটি, ‘ক্যাগ’ স্পেশাল সিকিউরিটি অডিট রেকমেন্ডেশন্স ইত্যাদি সুপারিশ বা নির্দেশ ক্রমাগত বিশ্বভারতীতে আসতেই থাকে। সম্প্রতি ২০১৭ সালে, আমি দায়িত্বভার নেওয়ার এক বছর আগে, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাত হওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আদেশ দেয়। এর থেকে বোঝা যায়, সীমানা-নির্ধারণ ও সম্পত্তি-সুরক্ষা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করা উপাচার্যের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। প্রতিবাদে মামলা-মোকদ্দমা হয়। কিন্তু এবারে মেলার মাঠের সীমানা-নির্ধারণ নিয়ে যা হল তা অতীতে কখনও হয়নি। সেদিনের ঘটনার ‘মোডাস অপারেন্ডি’ দেখলে সহজেই বোঝা যায়, পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। অথচ যে-মাঠের সীমানা-নির্ধারণ নিয়ে এত কাণ্ড সেটি মূল আশ্রমচত্বরের বাইরে, ভুবনডাঙার লাগোয়া একটা জায়গা।

বর্তমান মেলার মাঠের তিরিশ একর জায়গা বিশ্বভারতী পায় ১৯৪৬-’৪৭ সালে, তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, স্বল্পমূল্যে। তারও আগে ১৯৪২ সালে গুরুদেবের পুত্রতুল্য সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বিধবা পত্নীর সৌজন্যে বিশ্বভারতী এই মাঠের আশপাশের অনেকটা জায়গা পায়। সরকারের কাছ থেকে বিশ্বভারতী যখন মেলার মাঠের জায়গা কেনে তখন এখানে বিশ্বভারতীর কৃষিফার্ম, জল সরবরাহের প্ল্যান্ট এবং কোনও শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ ছিল। ১৯৬১ সালে ওই মাঠেই পৌষমেলা শুরু হয়, কারণ পুরনো মাঠে তখন আর মেলা আঁটছিল না। রাজ্য সরকার মাঠটির দু’দিক ঘিরে দিয়েছিল কয়েকদশক আগেই। বাকি ছিল দু’দিক। সেই দু’দিকে চার ফুট আট ইঞ্চির গাঁথনি দিয়ে তার উপর তিন ফুট লোহার তারজালি দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কারণ, জাতীয় পরিবেশ আদালত মেলা করার জন্য মাঠটিকে ‘সেপারেট সেলফ্ কনটেন্টেন্ড ইউনিট’ করার নির্দেশ দিয়েছিল, যা শুধু যে ঝোপঝাড় বা বার-ব্যারিকেড দিয়ে করা সম্ভব নয় তা খুব স্পষ্ট ছিল আমাদের কাছে। ওই ধরনের ব্যারিকেড এবং হাই মাস্ট আলোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সন্ধে হতেই ওই বিশাল মাঠের আনাচেকানাচে নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম চলত। ছাত্র-ছাত্রী, আশ্রমিক-কর্মী ও সংলগ্ন অফিসগুলির নিরাপত্তার কথা ভেবে এখনকার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আদলে, শান্তিনিকেতনের ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে মানানসই সাত-আটটা গেট-সহ একটা সীমানা-চৌহদ্দি করতে চেয়েছিলাম আমরা; যেখানে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলে প্রাতর্ভ্রমণকারী এবং খেলাধুলোয় উৎসাহীরা মাঠটাকে নিরুপদ্রবে ব্যবহার করতে পারতেন। ‘জেলখানা’ বানানোর কোনও উদ্দেশ্যই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের ছিল না! মেলার ইতিহাসে প্রকৃত ঐতিহ্যবাহী ‘পুরনো মেলার মাঠ’ ঘিরে দিয়েছিলেন তৎকালীন উপাচার্য। শরীর-চর্চার জন্য তবু তা বাধা হয়ে ওঠেনি! আশ্রমিকরা তা নিয়ে খুব শোরগোলও করেননি। তাহলে কী এমন কারণ ঘটল যে আজকের মেলার মাঠকে ‘জেলখানা’ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য দুবরাজপুর থেকে জননেতাকে ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে শান্তিনিকেতনে হামলা চালাতে হয়? এই কারণটি খুঁজে দেখার জন্যই সিবিআই তদন্ত দাবি করেছি আমরা।

আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র। সামাজিক-মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতিকরণের ‘খেলা’ যে বুঝি না, তা নয়। কিন্তু উপাচার্য হিসাবে তদন্তের দাবি করা ছাড়া এখনই তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। তবে আশ্রমিকদের একাংশকে স্মরণ করিয়ে দিই, রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি এবং প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ইন্দিরা দেবী আশ্রমিক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়কে একবার বলেছিলেন, ‘প্রত্যেক জিনিসকে পৃথকভাবে, কালের ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।’ একথা যথার্থ। দুষ্কৃতীরা যখন পে-লোডার দিয়ে কংক্রিটের গেট ভেঙে ফেলে, তখন বেড়াঝোপের বাউন্ডারি যে কতখানি অলীক-ভাবনা তা সহজেই বোঝা যায়। ইন্দিরা দেবীর মতো মানুষ ছিলেন সত্যিকারের আশ্রমিক। সত্যিকারের রাবীন্দ্রিক। তাঁদের মতো মানুষ বদ্ধ-চিন্তার অচলায়তনে স্বার্থমগ্ন জীবন কাটাতেন না।

আমি রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নই। আমি মনে করি, বিপদে-আপদে প্রতিবেশী গ্রামের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই রাবীন্দ্রিকতা। আমি বিশ্বভারতী বলতে বুঝি একটা পরিবার। আমি বিশ্বাস করি, মাঠে নেমে কাজ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, ‘বিশ্বভারতী’ বইতে লেখা গুরুদেবের একটি বাক্য: ‘আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা যন্ত্রে গুঞ্জন করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে।’

(মতামত একান্তই নিজস্ব)

লেখক উপাচার্য,
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
sanchitabidyut.chakrabarty@gmail.com